



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 953 - 961

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বাংলায় অনুদিত পাঞ্জাবি গল্পে সহিংসতার ভাষা ও মানবিক প্রতিস্বর

মৌসুমী পাত্র

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ

Email ID: mousumipatras@gmail.com

 0009-0000-9379-8960

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Partition,
Punjabi stories,
Communal
violence,
Humanitarian
catastrophe,
Humane
response.

Abstract

This article analyzes the multifaceted forms of violence in Punjabi short stories and the nature of the humane counter-narratives built against them. The pre-partition and post-partition Punjab regions bear brutal witness to communal violence and humanitarian catastrophe. As a result, the violent reality has naturally been reflected in Punjabi literature, especially in short stories. However, the stories did not end with descriptions of the violence. In parallel with the violence, a humane response has been constructed in some way in each story. The authors have shown that the potential of humanity is not completely exhausted even amidst extreme inhumanity. These stories, with their humanistic emotions and yearnings, are transformed into Bengali and enrich the Bengali reader with social consciousness which is extremely important in these recent communalism-ridden times.

Discussion

ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত অভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভাজিত হয়। ভাগ হয় ভারতবর্ষের দু'টি প্রদেশ বাংলা ও পাঞ্জাব। স্বাধীনতা বা দেশভাগের আগে থেকেই ঘটতে থাকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধি জনজীবনে বেড়ে চলা অস্থিরতা পাঞ্জাববাসীর জীবনকে বদলে দেয়। অমানুষিক হিংসা-হানাহানি, নৃশংসতা ও রক্তপাতের সাক্ষী হয় গুরু নানক, ওয়ারিশ শাহর জন্মভূমি। বর্বরতা ও হিংসার অভাবনীয় বহিঃপ্রকাশ সামাজিক বুননকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় যা দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, সংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক জীবনের অন্তর্নিহিত নিরাপত্তা বোধ থেকে গড়ে উঠেছিল। স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষেরাও অনেক ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক জনতার অংশ হয়ে উন্নত আচরণ করতে থাকে। দেশভাগ পরবর্তিতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিত্যযাপনের সঙ্গী হয়ে ওঠে। হিংসার এই বিস্ফোরণ সাহিত্যিকদেরও বিচলিত করে। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক হিংসা ও সীমান্তের অস্থিরতা, এই সবকিছুর অভিঘাত পাঞ্জাবি সমাজ জীবনে যে তীব্র সহিংসতার অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছে তার প্রতিফলন ঘটেছে পাঞ্জাবি সাহিত্যে, বিশেষত ছোটগল্পে। পাঞ্জাবি গল্পকাররা তাঁদের সাহিত্যে সহিংসতার নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে যেমন ভাষা দিয়েছেন তেমনই সেই সহিংসতার মধ্যেই

মানবিকতার ক্ষীণ অথচ দৃঢ় প্রতিস্বরকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। এই প্রতিস্বর কখনো প্রকাশ পেয়েছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতায়, কখনো শত্রুপক্ষের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে, আবার কখনো নিঃশব্দ প্রতিবাদে ও আত্মত্যাগ কিংবা নৈতিক দ্বিধার ভেতর দিয়ে। দাঙ্গার নির্মমতা ও ভয়াবহতা এবং সম্প্রদায়গত বিভেদ-বিদ্বেষের আবর্তে পাঞ্জাবি গল্পকাররা থেমে থাকেননি। বেশিরভাগ সাহিত্যিকরা ঘৃণা ও মৃত্যুর শাসনভূমিতে সৌহার্দ্য, সদ্ভাব ও মানবতার জয় গান গেয়েছেন। দাঙ্গাহাঙ্গামা হিংসা-হানাহানি তাঁদের রচনায় উঠে এসেছে ঠিকই কিন্তু গল্পগুলোতে শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রত মানবিক মূল্যবোধই জয়ী হয়েছে। তাই পাঞ্জাবি সাহিত্যে বিশেষ করে ছোটগল্পে দাঙ্গার নিষ্ঠুরতা, ধর্মীয় বিভাজনের অসারতা এবং মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা ও মানবিক দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। বাংলা ভাষায় অনূদিত পাঞ্জাবি গল্পগুলো এই অভিজ্ঞতাকে ভিন্ন এক ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে এনে হাজির করেছে। অনুবাদের মাধ্যমে পাঞ্জাবের দাঙ্গা আক্রান্ত ইতিহাস কেবল একটি আঞ্চলিক স্মৃতি হয়ে থাকেনি বরং তা সর্বভারতীয় মানবিক সংকটের প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং বাংলাভাষী পাঠকের কাছে নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে কয়েকটি বাংলায় অনূদিত পাঞ্জাবি গল্প নির্বাচন করে গল্পগুলোতে সহিংসতার বহুমাত্রিক রূপ এবং তার বিপরীতে নির্মিত মানবিক প্রতিস্বরের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিখ্যাত পাঞ্জাবি গল্পকার কর্তার সিং দুগ্গালের ‘নতুন বাড়ি’ গল্পটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লেখা। আলোচ্য গল্পে একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস ও কদাকার রূপ প্রকাশ পেয়েছে তেমনি অন্যদিকে ভয়াবহ দাঙ্গা-পরিস্থিতিতে কীভাবে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে সদ্ভাব ও সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখেছিল তার অনবদ্য রূপায়ণ ঘটেছে। দেশভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর কথক পরিবার নিয়ে পাকাপাকিভাবে পাকিস্তানের লাহোর থেকে ভারতবর্ষে চলে আসতে বাধ্য হন। তিনি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হওয়ার সুবাদে ভারতবর্ষে এসে মুসলিমদের ছেড়ে যাওয়া প্রশস্ত একটি বাংলাবাড়ি পান। সাধারণ উদ্বাস্তুদের মতো খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ও নিরাপত্তার জন্য তাকে লড়াই করতে হয়নি। কথকের স্মৃতিচারণ সূত্রে জানা যায় কথকের লাহোরের বাড়িতে দাঙ্গাবাজরা এসেছিল কেবলই কালের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন, তাদের অন্যায়ভাবে খুনজখম যখন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, জানা যায় তখনও কথকের গ্রামে দাঙ্গাবাজরা সবটুকু মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দেয়নি। আসলে দাঙ্গাবাজরা সকলেই ছিল কথকদের অত্যন্ত চেনাজানা পাশের গ্রামের পড়শী। তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই কথকদের বাড়িতে আগে থেকেই যাতায়াত ছিল। তাই তারা বাড়ির জিনিসপত্র সব লুণ্ঠ করলেও গৃহস্থের প্রতি কোনো সহিংস বা আক্রমণাত্মক আচরণ তারা করেনি। অন্যদিকে দাঙ্গাবাজদের প্রতি কথকের মায়ের সহানুভূতিও চোখে পড়ার মতো। দাঙ্গাবাজদের মধ্যে সাইদান খলিফার তিন ছেলে যখন ঘিঞ্জি অন্ধকার ভাঁড়ার থেকে জিনিসপত্র লুণ্ঠপাট করতে সচেষ্ট হয় তখন কথকের মা লুণ্ঠনের আলোয় তাদের পথ দেখান— সাপখোপ, বিছে, পোকামাকড় ইত্যাদির আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে যান। দাঙ্গাবাজরা সর্বস্ব লুণ্ঠ করে নিলেও তিনি তাদের প্রতি কোনোরকম প্রতিহিংসাপরায়ণ বা প্রতিশোধমূলক মনোভাব পোষণ করেননি। জানা যায় কেবল কথকদের বাড়িতেই নয় সারা গ্রামের পরিস্থিতি একই রকম ছিল। দাঙ্গাবাজরা গ্রামের কোথাও কোনোরকম হিংসাত্মক আচরণে লিপ্ত হয়নি, তারা কেবল ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিবেশীদের জিনিসপত্র লুণ্ঠপাট করেই ক্ষান্ত হয়। কথক যথার্থই বলেছেন —

“গাঁয়ের অন্য-সব বাড়িতেও এই একই ব্যাপার হ’ল। কারু গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি কিংবা কারু কান্নাও আকাশে উঠে যায়নি। সারাদিন ধ’রে লুণ্ঠপাট ক’রে দাঙ্গাবাজেরা বেঁটিয়ে সবকিছু নিয়ে চ’লে গিয়েছিলো।”

সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের কুটিল দাঙ্গাবাজদের এহেন আচরণ সুস্থ মনুষ্যত্বের কথা বলে।

আবার যখন লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি ইত্যাদি শহরে দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায় তখন কথকের এক মুসলিম বন্ধু তাদের দেশ ছেড়ে হিন্দুস্থানে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি পাকিস্তান পুলিশে কর্মরত থাকায় এক মুসলমান কনস্টেবলকে দিয়ে তাঁদের পাকিস্তান সীমান্তে পৌঁছে দেন। সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিবাদের সংঘাতময় পরিস্থিতিতে একজন হিন্দুর প্রতি, মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির এহেন আচরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বীভৎস দাঙ্গার দিনেও মানুষ নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে ভিন্নধর্মী মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছেন, তাঁদের মহত্বের জন্যই

বিবাদ-বিষম্বাদের অন্ধকার দিনগুলিতেও মনুষ্যত্ব বেঁচে ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাআক্রান্ত বিভীষিকাময় সময়ে মানবতার এই দৃষ্টান্ত আসলে দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মানবিক প্রতিস্বর।

একই লেখকের ‘মেয়েটিকে সে ধ’রে নিয়ে এসেছিলো’ গল্পটিতে ধর্মীয় স্বতন্ত্রতার আগ্রাসনের হিংস্র রূপ প্রকাশিত হয়েছে, পাশাপাশি নারকীয় হিংস্র মানসিকতার ভেতর থেকে শুভচেনার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। দেশভাগের ফলে সদ্যোজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রে হিন্দুরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হলে হিন্দুদের উপর মুসলিমদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন বৃদ্ধি পায়। ভিন্ন সম্প্রদায়ের মেয়েরা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। অপর সম্প্রদায়ের প্রতি হিংসা চরিতার্থ করার জন্য সেই সম্প্রদায়ের নারীদের প্রতি সহিংস আক্রমণ সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরবিরোধী হিংসাত্মক আচরণে ক্ষতবিক্ষত হয় নারী জীবন। এই উত্তাল ও অস্থির সময়ে নারীদের উপর শারীরিক নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, অপমান ও অসহায়তার কথা বহু সাহিত্যিকদের লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে। আলোচ্য গল্পটিও সেই উৎপীড়িত নারীদের অসহনীয় অভিজ্ঞতার দলিল। গল্পে রাজকর্নির অসহনীয় অভিজ্ঞতা আসলে ভারতবর্ষের বিভাজনকালীন তীব্র সাম্প্রদায়িক সংঘাতে অগণিত অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত নারীর বাস্তব অভিজ্ঞতা। দাঙ্গাপীড়িত রাজকর্নি সদ্যোজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রে মুসলিম ধর্মাবলম্বী পুরুষ শাহজাদ খানের আক্রমণের শিকার। রাজকর্নি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরাকাষ্ঠা সোহেন শাহর একমাত্র কন্যা - তার বৃদ্ধ বাবার একমাত্র আশ্রয় ও সাহুনা। অন্যদিকে শাহজাদ খানের পিতাও ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, তার মাও একজন হিন্দু রমণী। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহে বেড়ে ওঠা দু’জন মানুষ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে পরস্পরবিরোধী শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

শাহজাদ খান কামনায় মাতাল হয়ে রাজকর্নিকে অপহরণ করে এক পাথুরে টিলার উপর নিয়ে আসে। তার সৌন্দর্য ও লাবণ্যে মোহিত হয়ে শাহজাদ এক বন্য উল্লাসে মেতে ওঠে। যদিও তার অন্তরে বাল্যকাল থেকেই হিন্দু মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের শক্ত ভীত গড়ে উঠেছিল কিন্তু হিংসা ও বর্বরতায় সে ধ্বংসাত্মক জনতার অংশ হয়ে উন্মত্ত আচরণে লিপ্ত হয়। তার কামোন্মত্ত দৃষ্টি রাজকর্নির অসহায়তা দেখতে পায় না। বরং তার প্রতি রাজকর্নির নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত দৃষ্টি শাহজাদ খানের পৌরুষকে আহত করে। সে পাথুরে টিলা থেকে রাজকর্নিকে টেনে নিয়ে যায় নিচে বয়ে চলা শ্রোতস্বিনীর কাছে, লেখকের কথায় —

“...মেয়েটিও তার সঙ্গে-সঙ্গে গেলো, কশাইয়ের সঙ্গে ভেড়া যেমন যায় কশাইখানায়।”^২

মেয়েটি দুঃখে যন্ত্রণায় পাথরের মতো নিঃশ্বর হয়ে পড়ে। শাহজাদ খান রাজকর্নির এই পাথরের মতো মূর্তিমান অবস্থা দেখে বিষম বিরক্ত হয়। মেয়েটির উপেক্ষা তাকে ক্রোধে উন্মত্ত করে। সে হতবাক হয়ে পড়ে — ঠায় শুধু তার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে। অথচ সে চাইলেই অনায়াসে অবলীলাক্রমে মেয়েটিকে জোরপূর্বক খুন বা ধর্ষণ করতে পারত কিন্তু সে তা করেনি। মেয়েটির অসাড়ভাব তার মানসিকতার পরিবর্তন করে, তার মনে হয় সে যেন অন্ধকারের এক অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে এক কালো অন্ধকার তার মনে তুফান তোলে। চারিদিকে ক্রুড় ও নির্মম হিংস্রতার বাতাবরণে তার মধ্যে অপরাধবোধ জেগে ওঠে — মানবিক অনুভূতির উদ্রেক হয়। সে আকস্মিকভাবে রাজকর্নিকে নদীর কিনারায় ফেলে পালিয়ে যায়। যাকে সে ধরে এনেছিল সম্ভোগের জন্য তাকে উপেক্ষা করে সে প্রাণপণে ছুটে চলে। লেখক বর্ণনা করেছেন —

“সে ছুটতে শুরু করলে! পালিয়ে যাচ্ছে সে, প্রাণপণে ছুটছে। জানে না কোথায় পালাবে। ছুটতেই থাকলো সে, অবিশ্রম ছুটতে থাকলো।”^৩

যে ক্রুড় হিংসায় উন্মত্ত হয়ে সে রাজকর্নিকে তুলে এনেছিল এবং লুণ্ঠ করেছিল হিন্দুর সম্পত্তি তার সবকিছুকেই ফেলে পালিয়ে যায়। আসলে অপরাধবোধের তাড়নায় সে এই অবিশ্রাস্য হিংসা ও নৈরাজ্যের জগৎ থেকে পালিয়ে যেতে চায়, — এই উদ্দেশ্যেই তার ছুটে চলা — শাহজাদ খানের এই মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লেখক আসলে হিংসা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে চিরন্তন মানবতার জয় ঘোষণা করেছেন। লেখক বলতে চেয়েছেন হিংসা-হানাহানি সাময়িক, চিরন্তন হল মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা, সহৃদয়তা ভালোবাসা।

মহিন্দার সিং জোশির ‘মোতি’ গল্পটি দেশভাগ পরবর্তী পূর্ব-পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হানাহানির প্রেক্ষিতে রচিত। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পূর্ব-পাঞ্জাবের নিরীহ-নির্বিরোধ সংখ্যালঘু মুসলিমদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। দেশভাগান্তর কালে ভারতবর্ষের ভূখণ্ড, সমাজ, সমাজের মানুষগুলো তাদের ‘শত্রু’ হয়ে যায়। গল্পের আল্লাদিত্তা ও তার স্ত্রী দেশভাগ হবার পরও তাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতি বিজড়িত জন্মভূমি ছেড়ে পাকিস্তানে যেতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হানাহানিতে হারায় দুই ছেলেকে। তবুও তারা ভারতবর্ষের মাটিকে ভালোবেসে ঘর-গেরস্থালি আঁকড়ে থেকে যায় ভারতবর্ষে। প্রতিবেশী সুজনরা তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে পরামর্শ দেয় পাকিস্তানে চলে যাওয়ার জন্য কিন্তু আল্লাদিত্তার মন তাতে সায দেয় না। ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তিতে যে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের পত্তন হয়েছে তা সম্পূর্ণ অচেনা অজানা এক দেশ। এই সদ্যোজাত দেশটি তার ভাবনায় ‘স্বদেশ’ হিসেবে ধরা দেয় না, এই চেতনা বা বোধ তার দেশ ছাড়ার পথে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর যখন দাঙ্গার আগুনের লেলিহান শিখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন গ্রামের শিখ মুরাব্বির শতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আল্লাদিত্তাকে ডেকে ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা বলেন। দাঙ্গাবাজদের হিংস্র আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে আল্লাদিত্তার শিখধর্ম গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শিখদের সহিংস সাম্প্রদায়িকতা যখন সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রাণ কেড়ে নিতে উদ্যত তখন এই শিখদেরই একাংশ তাদের প্রতিবেশী মুসলিমদের প্রাণ রক্ষার উপায় খুঁজে বেড়ায়। এই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক শিখদের কাছে ধর্মের থেকে প্রাণের মূল্য অনেক বেশি। ধর্মান্তরকে তারা কেবল প্রাণরক্ষার উপায় হিসেবেই বিবেচনা করে বিষয়টিকে কেবল নাম পরিবর্তন বলে গুরুত্বহীন মনে করে। দাঙ্গাবাজদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষার করার আল্লাদিত্তার একটি শিখ নাম সেই উন্নত পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অতঃপর আল্লাদিত্তা হরদেও সিং হয়ে ওঠে। যদিও তার জীবনে কোনো হেরফের ঘটেনি। হরদেও সিং ওরফে আল্লাদিত্তা এবং তার স্ত্রী রুক্মি সন্তান হারানোর শোককে বুকে চেপে দিনযাপন করতে থাকে — এই ভাবেই গল্পটি শেষ হয়েছে। আলোচ্য গল্পে একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িকতার উলঙ্গ রূপ প্রকাশ পেয়েছে তেমনি আল্লাদিত্তার প্রতি পড়াশুনার আচরণে মানবিক চেতনার স্ফূরণ ঘটেছে। গল্পটির মধ্য দিয়ে লেখক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তথা হিংসার বিরুদ্ধে মানবতার এক সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ধ্বনিত হয়েছে।

দেশভাগের ক্ষত নিরাময় হওয়ার আগেই আটের দশকে পাঞ্জাব হিন্দু-শিখ দাঙ্গায় কার্যত বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। শিখ জাতির এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কিছু দুর্বলতার মধ্য দিয়ে শিখদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও সন্ত্রাসবাদ জন্ম নেয়। এই সময় পাঞ্জাবে মানবতার বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ পরিপুষ্ট হয়। ফলে মানুষের জীবন বিপন্ন হয় এবং একটি সার্বিক বিপদের সূচনা হয় — এই প্রেক্ষিতেই লেখা হয় অসংখ্য পাঞ্জাবি গল্প। রক্তাক্ত সময়ে লেখা রামস্বরূপ আণখীর ‘হাড্ডিগুলি’ গল্পটিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভৎস কদাকার চিত্র উঠে এসেছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুকুন্দের জীবনের একমাত্র সম্বল ছিল তার ছেলে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অকালে তার প্রাণ যায়। ছেলের মৃত্যুর পর প্রতিদিন তার আঙিনায় মানুষের কাঁটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রথম দিন মুকুন্দ উঠোনে জলের পাম্পের পাশে একটি মানুষের হাড়ের টুকরো পেয়ে তার প্রতিবেশী মঙ্গল ও বারুকে দেখানোর জন্য থলিতে ভরে নিয়ে আসে। হাড়ের কথা শুনে প্রথমত মঙ্গলের মনে হয় হয়তো কোনো কাক কিংবা কুকুরের কাজ। কিন্তু দিনের পর দিন একই ঘটনা ঘটে যাওয়ায় মঙ্গলের মনে পড়ে— খবরের কাগজ পড়ে সে জেনে ছিল মন্দিরে গরুর লেজ, শিঙা, কান ইত্যাদি পড়ে থাকার কথা— এই সূত্রে তৎকালীন সময়ে দাঙ্গার ভয়াল ছবিটি স্পষ্ট হয়। মঙ্গল বাস্তব পরিস্থিতি বুঝলেও সন্তান হারানো পিতা মুকুন্দ তা বোঝে না, সে ভাবে —

“এটা হয়তো আমার পরতাপের হাড্ডি।”^৪

—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তার মনে হয় প্রতাপ জীবিত এবং পুলিশের লোকেরা প্রত্যহ প্রতাপের একটি করে অঙ্গ কেটে রাতের আঁধারে চুপিসারে তার আঙিনায় ফেলে যায়। তাই সে কাঁটা অঙ্গগুলো কুয়াতে ফেলে আসে। ধর্মপ্রাণ মানুষ মুকুন্দের বিশ্বাস ছিল কাটা অঙ্গগুলি জুড়ে গিয়ে একদিন তার ছেলে সুস্থ দেহে ঘরে ফিরে আসবে। হঠাৎ করে মুকুন্দকে দেখা না গেলে সকলেই তার খোঁজ করতে থাকে। মুকুন্দের বউ আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে লোক পাঠায় কিন্তু তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। ক্ষেতে খামারে খোঁজাও নিষ্ফল হয়। বিগত কয়েকদিন ধরে গ্রামের কুঁয়োতে মুকুন্দের যাতায়াত থাকায় সকলের

কুঁয়োটিকে ঘিরে সন্দেহ হয়। প্রতিবেশীরা সকলে কুঁয়োর পাশে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে গভীরে একটা কালো জিনিস দেখতে পায়। সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে দড়ি বেঁধে কুয়োতে লোক নামানো হয় — জানা যায়, কুয়োর ভেতরেই মুকুন্দ মারা গেছে।

সমগ্র গল্প জুড়ে দাঙ্গার ভয়াবহ ও নির্মম পরিণতি প্রত্যক্ষ হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা মুকুন্দ। ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সুখের সংসার ভেঙ্গে যায় দাঙ্গার করাল গ্রাসে। তার শিক্ষিত যুবক ছেলের প্রাণ যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবলে — এই মৃত্যু মুকুন্দের জীবনকে তছনছ করে দেয়। মুকুন্দের বাড়ির উঠানে প্রত্যহ মানুষের কাটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়ে থাকার মধ্য দিয়ে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বিভীষিকাময় পরিস্থিতির ছবি যেমন স্পষ্ট হয় তেমনই সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো জুড়ে গিয়ে আবার প্রতাপ জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবে এ ভাবনাও যথেষ্ট অমূলক — যা মুকুন্দের অপ্রকৃতস্থ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। এই অমূলক ভাবনাই শেষ পর্যন্ত মুকুন্দকে মৃত্যুমুখে পতিত করে। অর্থাৎ বলা যায় দাঙ্গার প্রত্যক্ষতায় ছেলে প্রতাপের মৃত্যুই পরবর্তীতে মুকুন্দের মৃত্যুর কারণ — যা দাঙ্গার নির্মম পরিণতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দাঙ্গার ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে।

মাহিন্দার সিং সর্নার ‘মার-কাটারির মরশুম’ গল্পের প্রেক্ষাপট দেশভাগজনিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। গল্পের একদিকে যেমন আছে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ভয়ানক রূপ তেমনি আছে মানুষের প্রতি মানুষের সহজাত মমতা। গ্রামের দীনা কামার যে দাঙ্গার পূর্বে কেবল কৃষিকাজের উপকরণ কাপ্তে-খুরপি বানাত সে দাঙ্গাপ্রবণ ছেলে বশীরের নির্দেশে বাধ্য হয় টাঙ্গি কাটারি হেঁসো আর সড়কি-বল্লম তৈরি করতে। দাঙ্গাউন্মত্ত এই সময়ে টাঙ্গি কাটারি আর সড়কির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। দীনার ছেলে বশীর বাবাকে দিনরাত টাঙ্গি ও সড়কির বরাত দেয়। বশীর ও তার অনুগত দাঙ্গাবাজদের কাছে সদ্যোজাত পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে হিন্দু আর শিখদের আগাছা সাফ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে, তাই তাদের একমাত্র প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় টাঙ্গি ও সড়কির পর্যাপ্ত জোগান। ছেলের নির্দেশ টাঙ্গি জোগালেও দীনা ও তার স্ত্রী মনোকষ্টে ভোগে। বিবেকের দংশনে তার হৃদয় জর্জরিত হয় মুহূর্মুহ। মানবতার এই সংকটলগ্নে একজন সহিষ্ণু ও সহানুভূতিশীল মানুষ হিসেবে দীনা গভীর দুঃখে নিমজ্জিত হয়।

হিংসাত্মক, নির্মম ও নিষ্ঠুর পরিস্থিতিতে তাদের গ্রামের চারিদিক হিন্দুদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে — গ্রামে হিন্দুদের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, দীনার ছেলে বশীর সহ তার সাগরেদরা হিন্দু ও শিখ নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় একে একে প্রাণ যায় গ্রামের সমস্ত অ-মুসলিমদের। চরম বিপর্যয়কর দুঃসময়ে বেঁচে থাকে কেবল এক বৃদ্ধা — গ্রামের খত্ৰীদের একমাত্র চিহ্ন হিসেবে। সে আশ্রয় নেয় দীনার বাড়িতে। সাম্প্রদায়িক হিংসায় উন্মত্ত এই সময়ে যখন দীনার ছেলে বশীর হিন্দু-শিখ-নিধনযজ্ঞের মূল হোতা তখন তাদের বাড়িতে বৃদ্ধার আগমন উভয় পক্ষের কাছেই চরম ভীতিপ্রদ ও আশঙ্কার। বশীর বৃদ্ধার খবর জানতে পারলে বৃদ্ধা ও দীনা এবং দীনার স্ত্রী কেউই তার হাত থেকে রেহাই পাবে না - এই নিদারুণ সত্যটি জানা সত্ত্বেও দীনার স্ত্রী বৃদ্ধার অসহায়তায় তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, সে বলে —

“...চাচি, তুই বরং আমাদের কুঠিতেই থেকে যা। ঠাকুরবাড়িতে তো তুই একলাই প’ড়ে থাকিস, তার ওপর অ্যাদিন ধ’রে জ্বরে ভুগে উঠেছিস। এখানেই রসুই পাকিয়ে নে, ঠাকুরবাড়ি থেকে বরং নিজের বাসনকোশনগুলো নিয়ে আয়। হিন্দুর ঘরে জন্ম- আমাদের ছোঁয়া তোকে খেতে হবে না।”^৫

মানুষে-মানুষে ঘৃণা আর হিংসা যখন তুঙ্গস্পর্শী সেই ঊষর সময়ে বৃদ্ধার প্রতি দীনার স্ত্রীর এই অপরিমীয়া ভালোবাসা সুস্থ মানবতার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে কিন্তু দুর্বলচিত্ত দীনা ছেলের ভয়ে বুড়িকে আশ্রয় দিতে পারেনা। বুড়ি ফিরে যায় তার নিজের আশ্রয়ে। দীনাকে ঘিরে ধরে একরাশ হতাশা। ছেলের মেজাজের ভয়ে সে বসে যায় আবার টাঙ্গি তৈরি করতে কিন্তু কিছুতেই সে আর টাঙ্গি তৈরি করতে পারেনা। এবার তার ভয় তাকে বশীভূত করতে পারেনি, সে হাপরের সামনে থেকে উঠে গিয়ে জানলা খুলে বাইরে পালিয়ে যায় — এই হানাহানি থেকে অনেক দূরে। কিন্তু পালিয়ে গিয়েও কৃতকর্মের জন্য সে অন্তরে এক গভীর ক্ষত অনুভব করে। সে ভাবে —

“...এই রক্তারক্তি খুনোখুনি ঘটেছে তার নিজের হাতে গড়া টাঙ্গিগুলো দিয়ে, তারই তৈরি কাটারি আর সড়কি দিয়ে বোনা হয়েছে রক্তমাংসের ফসল।”^৬

—এই ভাবনায় সে উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ফিরে আসে — কোনো পুকুরে বা কুয়োয় টাঙ্গিগুলো ফেলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু গাঁয়ে এসে যখন পৌঁছলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে — বশীরের টাঙ্গির আঘাতে বৃদ্ধা তখন মৃত — পুরো গ্রাম থেকে হিন্দু ও শিখরা নিশ্চিহ্ন। এই যজ্ঞা সহ্য করতে না পেরে সেই রাতের বেহুশ হয়ে পড়লে দীনা আর কখনও উঠে দাঁড়াতে পারেনি। এভাবেই নির্দয় নিষ্ঠুর অমানবিকতার কাছে পরাভূত হয় মানবতা। অসাম্প্রদায়িক মানসের অধিকারী দুটি মানবিক মানুষের এই অপমৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখক আলোচ্য গল্পে সাম্প্রদায়িকতার নির্মম স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। পাশাপাশি দীনা ও বৃদ্ধা চরিত্রের মানবিক আচরণের মধ্য দিয়ে লেখক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে এক ধরনের নৈতিক প্রতিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অজিত কাউরের ‘কানাগলি’ গল্পটি আটের দশকে হিন্দু-শিখ দাঙ্গার প্রেক্ষিতে রচিত। গল্পটিতে একাধারে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বীভৎসরূপ এবং হিংসার বিপরীতে মানুষের প্রতি মানুষের স্নেহ-ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। গল্পের কথক একজন সাধারণ পরিবারের মেয়ে। তাঁদের চারজনের পরিবার ছিল স্নেহ-ভালোবাসায় পূর্ণ। আকস্মিকভাবে তাঁর বাবার মৃত্যু এবং দাদা কেবল খুন হওয়ার পর তাঁদের জীবন অন্য খাতে বইতে থাকে। মা আর মেয়ের সংসারে যেন ঝড় নেমে আসে। হঠাৎ একরাত্রে তিনি বাড়ির উঠানের শেষ প্রান্তে, খিড়কি দুয়োরের কাছে বাতিল জিনিসপত্র রাখার ছোট্ট ঘরটিতে এক ব্যক্তির উপস্থিতি টের পান। কথক বলেছেন—

“সে আমাকে ভয় পাচ্ছে, আর আমি তাকে। দুজনের কেউই নড়তে পারছি না।”^৭

নানা অজানা ভয় ও আতঙ্ক কথককে গ্রাস করে এবং এই মুহূর্তেই তিনি জানতে পারেন ব্যক্তিটি গুলিবিদ্ধ এবং পুলিশের তাড়া খেয়ে তাঁদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে ব্যক্তিটির পরিচয় নিয়ে তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর ভয়কে উপেক্ষা করে তিনি আহত ব্যক্তিটির প্রাথমিক শুশ্রূষা করেন। ইতিমধ্যে পুলিশের লোক এসে জানায় আগের দিন রাতে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে পুলিশের গুলির লড়াইয়ে একজন উগ্রপন্থী আহত অবস্থায় গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। পুলিশের লোকেরা আহত উগ্রপন্থীকে কেবলকে যারা খুন করেছে সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনার কথাও জানায়। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিটি তার দাদার খুনি হতে পারে — এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেও কথক আহত ব্যক্তিটির পরিচর্যায কোনো খামতি রাখেননি। ব্যক্তিটি তাঁর ভাই কেবলের খুনি বা খুনিদের সাগরেদ হতে পারে জেনেও ভাইয়ের মতো মমতায় আশ্রয় দিয়ে আগলে রাখে — কথকের এই সহানুভূতিশীল আচরণ মানবতার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। অন্যদিকে দেখা যায় আহত ব্যক্তিটিও কথকের মায়া-মমতা স্নেহ-যত্নে স্পর্শ অনুভব করে অভিভূত হয়। শরীরে পুরো সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে যখন মৃত্যু প্রায় আসন্ন তখন সে কথককে বলে —

“... আমি এখানে মরতে চাই না। যদি মরি, তা’হলে আপনি কী ক’রে লাশটা বাইরে নেবেন? বহিনজি, এতক্ষণ-তো কত মুশকিল করলাম আপনার। আমি আর আপনাকে ঝামেলায় ফেলতে চাই না।”^৮

একজন উগ্রপন্থী হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তি, হিন্দুদের শত্রু হিসেবেই যার পরিচয় তার তথাকথিত শত্রু সম্প্রদায়ের প্রতি সহমর্মী আচরণ থেকে বোঝা যায় সে উগ্রপন্থী হলেও তার মধ্যেও মনুষ্যত্ব বেঁচে আছে। পুলিশি কুকুরের সহায়তায় বুঝতে পারে কথকের বাড়িতেই আহত উগ্রপন্থী আত্মগোপন করে আছে। কথক কৌশলে পুলিশের তদন্তকে দীর্ঘায়িত করে কিছুটা সময় চেয়ে নেন এবং এই সময়ের মধ্যেই তিনি আহত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন, কথক সেই সাক্ষাৎ মুহূর্তটির বর্ণনা করেছেন—

“আমি তাকে থাকতে বলিনি। পারিনি বলতে। আমরা দুজনেই ততক্ষণে জেনে গিয়েছি যে একটা কানাগলির মধ্যে এসে পড়েছি আমরা, অন্ধ একটা গলি, পালাবার সব রাস্তাই রুদ্ধ, কোথাও যাবার কোনো উপায় নেই।”^৯

এক বুক মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে কথক মুমূর্ষ ব্যক্তিটিকে বাইরে বিপদের মধ্যে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং ব্যক্তিটিও তার শারীরিক যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র কথকের নিরাপত্তার কথা ভেবে তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মৃত্যুর দিকে পা বাড়ায়। ব্যক্তিটি বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পরপর বুলেটের শব্দ কথকের হৃদয়কে ঝাঁঝরা করে দেয়। মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রতি ধ্যে আসা বুলেটের শব্দ কথকের মায়ের মনে তার মৃত ছেলের স্মৃতি ব্যথার অনুরণ তোলে। আহত ব্যক্তিটি এবং কথকের পরস্পরের প্রতি যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রকাশিত হয় তা সেই উপদ্রুত পরিস্থিতিতে মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। মানুষে-মানুষে ঘৃণা আর অবিশ্বাসের বিষবাস্প যখন চারিদিক আচ্ছন্ন করেছে তখন মানুষের প্রতি মানুষের অপরিমেয় ভালোবাসার অনিরুদ্ধ প্রকাশ মানবতার প্রতিস্বর।

দেশভাগ ভারতবর্ষকে ছিঁড়ে দুখও করে দিয়েছিল। দেশভাগের পর, যে ভাগাভাগিকে সাম্প্রদায়িক ফাঁসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসেবে মনে করা হয়েছিল বাস্তবে তা হয়নি। দেশভাগ পরবর্তী ভারতবর্ষের নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিস্ফোরণ ঘটে। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের এই বিস্ফোরণে উদ্ভিন্ন হয়ে উদারনৈতিক মানবতাবাদী লেখকরা তাঁদের লেখনির মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সজীব করতে প্রয়াসী হন, এরকমই সদর্থক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় গুলজার সিং সোক্ষির ‘দেবতারাই কাঠগড়ায়’ গল্পটিতে। উক্ত গল্পটিতে একদিকে যেমন অভাবনীয় হিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তেমনি অন্যদিকে বিভেদ ও বিদ্বেষের বিপরীতে সম্প্রীতিচেতনাকে জাগিয়ে তোলার সচেতন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। গল্পটি স্বাধীনতা পরবর্তী বা বলা ভালো দেশভাগ পরবর্তী পূর্ব-পাঞ্জাবে সংঘটিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রেক্ষিতে রচিত। ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতার সূত্রে দেশভাগের ঘটনা ধর্মাত্মতা ও জাতিবিদ্বেষ প্রকট করে। যে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে থাকতে চায় পূর্ব-পাঞ্জাবের শিখরা তাদের ধর্মান্তরিত হবার নির্দেশ দেয়। কারণ পশ্চিম-পাকিস্তানের রয়ে যাওয়া হিন্দু আর শিখদেরও এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এলাকার সর্বত্রই বেশ ধুমধাম করে মুসলমানদের ধর্মান্তকরণ হয়। প্রত্যেক মুসলমানকে শিখধর্মের পাঁচটি চিহ্ন ধারণ করানো হয় এবং পাকিস্তানে হিন্দুদের গোরুর মাংস খাওয়ানোর সমুচিত জবাব হিসেবে এপারের মুসলমানদের শুয়োরের মাংস খাওয়ানো হয়। দাঙ্গা-আক্রান্ত এই সময় গলায় হলুদ কাপড়ের টুকরো পূর্ব-পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু মুসলমানদের রক্ষাকবচ হয়ে ওঠে। এই উন্মত্ত পরিস্থিতিতে কথকের মাস্টারমশাই বদরু মিঞার পরিবার প্রকাশ্যে বা আনুষ্ঠানিক ভাবে শিখধর্ম গ্রহণ থেকে রেহাই পান। কথকের বাবা তাদের সে-সুযোগ করে দেন। ভিন্ধর্মের পড়শীর প্রতি এই সহিষ্ণু মনোভাব সোহাদ্য ও সম্প্রীতির অনন্য নজির।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উন্মত্ত পরিস্থিতিতে কথকের বাবার ভিন্ধর্মী প্রতিবেশীদের প্রতি এই সহনশীল ও দরদী মনোভাব বদরু মিঞার পরিবারকে সুরক্ষা দিতে পারেনি। একদিন বদরু মিঞা ও তার কন্যা নূরা পীরসাহেবের মাজারে একটি বটগাছের আড়ালে নামাজ পড়ছিলেন। এই অবস্থায় কথকের চোখের সামনে দাঙ্গাকারীরা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বদরু মিঞা গলায় হলুদ কাপড়ের টুকরো ও শিখধর্মের চিহ্ন হাতের বালা দেখানো সত্ত্বেও দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে রেহাই পাননি। ইতিমধ্যে খবর আসে কথকের বাবার বাল্যবন্ধু ঘনশ্যাম দাশ এক মুসলমান বন্ধুকে হলুদ রুমাল পোঁছে দিতে গিয়ে হঠাৎ দাঙ্গাকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। দাঙ্গাকারীরা তাকে সদ্য ধর্মান্তরিত বলে ভুল করেছিল। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে যার কাছেই নতুন হলুদ রুমাল ছিল তাকেই হত্যা করা হত। এর মধ্যেই কথকের জীবিত অবস্থায় ফিরে আসার আনন্দ-উত্তেজনায় পুরো গ্রাম প্রস্তুত হয়ে ওঠে শহীদদের উদ্দেশ্যে প্রসাদ চড়বার জন্য। কিন্তু ঘনশ্যাম দাশের আকস্মিক অভাবিত মৃত্যু সকলকেই সন্ত্রস্ত করে তোলে। গ্রামবাসীদের কাছে হলুদ রুমাল হাতে ঘনশ্যাম দাশের মৃত্যুর তাৎপর্য অনুভূত হয় —

“... হলুদ রুমাল হাতে থাকলে যে-কেউ যে-কোনো মুহূর্তে খুন হ’য়ে যেতে পারে, তা সে হিন্দুই হোক বা শিখই হোক। তাহ’লে তো ধর্মান্তরিতদের জীবনের কোনো নিশ্চয়তাই নেই।”^{১০}

—এই একই ভাবনা প্রতিফলিত হয় কথকের ঠাকুরদা বাবাজির মধ্যে। ফলস্বরূপ শহিদ ময়দানে, শহিদদের গুণকীর্তন করবার সময় বাবাজি অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। যে শহিদরা ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের জন্য যথাসর্বস্ব প্রাণ দিয়েছেন তাদের গুণকীর্তন করতে গিয়ে বাবাজির হাত থেকে খাপা খসে পড়ে যায়। তার ধর্মচিন্তার বদল ঘটে, তিনি কথকের বাবাকে নির্দেশ দেন —

“বাচ্চাকে বলো পীরের মাজারেও একটু পরসাদ চড়িয়ে আসুক, ...”^{১১}

কিন্তু কথকের বাবা তার এই সিদ্ধান্তে কিছুতেই সম্মত হন না। তখন বাবাজি তার ভয়ের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন –

“... কে বলতে পারে যে শেষটায় এটাই প্রমাণ হবে কি না আমাদের শহিদদের চাইতে পীরসাহেবেরই জোর বেশি।”^{১২}

অর্থাৎ শিখ ধর্মের শহিদ যারা স্বধর্মের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ, যারা ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাদের প্রতি সংশয় প্রকাশ করেন। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিখুঁত উদাহরণ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি ও ঐক্যের প্রতীক পীরসাহেবের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন। এই ব্যাখ্যার পর তার কথার অর্থ সকলের কাছে বোধগম্য হয়। কথক খানিকটা পরসাদ নিয়ে পীরসাহেবের মাজারের দিকে ছুটে যান – তার বাবাও আর বাঁধা দেন না। পীরসাহেবের, শহিদ পূজার পরসাদ প্রাপ্তি পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম পরাকাষ্ঠা বাবাজির চরিত্রের এই বদলের মধ্য দিয়ে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন দাঙ্গা মানুষের সহজাত মানবতাকে ধ্বংস করলেও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারে না – এই মানবিক প্রতিশ্রুতির গল্পটিকে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান প্রদান করে।

সবশেষে বলা যায় পাঞ্জাবি গল্পে সহিংসতা ও মানবিক প্রতিশ্রুতির অন্বেষণ বর্তমানে বাংলা ভাষার পাঠকের কাছে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। আলোচিত গল্পসমূহে সহিংসতা প্রধানত তিনটি স্তরে প্রতিভাত হয়েছে। শারীরিক সহিংসতা, মানসিক সহিংসতা এবং কাঠামোগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সহিংসতা। দাঙ্গা-হত্যা-লুণ্ঠন-ধর্ষণ জোরপূর্বক উৎখাতের মতো ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে সহিংসতার প্রকাশ ঘটলেও গল্পগুলোতে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ফুটে উঠেছে মানুষের অন্তর্গত ভাঙ্গন এবং অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা। বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে এই সহিংস অভিজ্ঞতা বাঙালি পাঠকের কাছে কেবল অন্য ভাষার ইতিহাস হয়ে হয়ে থাকে নি বরং তা এক সামগ্রিক ভারতীয় অভিজ্ঞতার অংশ হিসেবে ধরা দেয়। তবে এই গল্পগুলো প্রকৃত গুরুত্ব নিহিত আছে সহিংসতার সমান্তরালে নির্মিত মানবিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে। সহিংসতার অন্ধকারে লেখকরা মানবিক মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে দেননি বরং তাঁরা দেখিয়েছেন চরম নৃশংসতার মধ্যেও মানুষের মানবিক গুণাবলীর স্ফুরণ। গল্পগুলোতে যাবতীয় ধর্মীয় পরিচয় উর্ধ্বে উঠে এবং সমস্ত রকম বিভাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লেখকেরা তাঁদের গল্পে মানবিক সহমর্মিতা ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক ও সহানুভূতির মুহূর্তগুলিকে গুরুত্ব সহকারে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার কথা তাঁদের রচনায় বারবার এসেছে। অনেক গল্পে দেখা যায় ভিন্ন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মানুষ বিপন্ন মানবজীবনকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে, যা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই মানবিক প্রতিশ্রুতির সহিংসতার বিরুদ্ধে এক নীরব অথচ দৃঢ় প্রতিবাদ হিসেবে কাজ করে। অতএব বলা যায় বাংলায় অনুদিত পাঞ্জাবি গল্পগুলো সহিংসতার নৃশংস দলিল হওয়ার পাশাপাশি মানবতার ঘোষণাপত্র হিসেবেও বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। সর্বোপরি গল্পগুলো আমাদের সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক সংকটপূর্ণ বর্তমান সময়ে মানবতা ও সম্প্রীতির পথে পথিক হতে প্রাণিত করে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন (২য় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৯৮
২. তদেব, পৃ. ৩০৭
৩. তদেব, পৃ. ৩০৯
৪. ভট্টাচার্য, শ্যামল (অনুবাদ ও সম্পাদনা), সমকালীন পাঞ্জাবী গল্প, অক্ষর পাবলিকেশন্স, কলকাতা, পৃ. ৫২
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদিত), ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন (২য় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩৮১
৬. তদেব, পৃ. ৩৮৩
৭. তদেব, পৃ. ৩৪৬

৮. তদেব, পৃ. ৩৫৫

৯. তদেব, পৃ. ৩৫৬

১০. তদেব, পৃ. ৩৩০

১১. তদেব, পৃ. ৩৩১

১২. তদেব, পৃ. ৩৩১-৩৩২